একক ৮ ❐ মানকুমারী বৃত্ত

গঠন

৮.১ মানকুমারী বসুর কবিতা

৮.২ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ঃ "কবরই-ই-নূরজাহান"

- ৮.২.১ উৎস ও ইতিহাস
- ৮.২.২ কাব্য প্রেরণা
- ৮.২.৩ কবিতা বিশ্লেষণ
- ৮.২.৪ কাব্যগঠন : ভাষা ও ছন্দ

৮.৩ নজরুল ইসলামের কবিতা : বিদ্রোহী

- ৮.৩.১ বিদ্রোহী রচনার পশ্চাৎপট
- ৮.৩.২ কবিতা বিশ্লেষণ : ভাববস্তু
- ৮.৩.৩ রোমান্টিক আবেগ উচ্ছ্বাস
- ৮.৩.৪ বায়রন ও উইট ম্যানের সঙ্গে তুলনা
- ৮.৩.৫ দেশবিদেশের পুরাণ ব্যবহার
- ৮.৩.৬ উপসংহার

৮.৪ মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা : কালাপাহাড়

- ৮.৪.১ রবীন্দ্রবিরোধিতার সূচনা
- ৮.৪.২ মোহিতলালের কবিতায় রবীন্দ্রবিদ্রোহ
- ৮.৪.৩ কালাপাহাড় কবিতায় বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয়
- ৮.৪.৪ কবিতা বিশ্লেষণ
- ৮.৪.৫ কবিতার গঠন বিশ্লেষণ
- ৮.৪.৬ বস্তু প্রাণতা ও কল্পনা প্রাণতার সমন্বয়

৮.৫ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা : ঘুমের ঘোরে

- ৮.৫.১ কবিতা—বিশ্লেষণ
- ৮.৫.২ যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে জন ডানের সাদৃশ্য
- ৮.৫.৩ কবিতার প্রত্যেকটি ঝোঁকের বক্তব্য ও ভঙ্গি বিশ্লেষণ
- ৮.৫.৪ উপসংহার ঃ যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের বৈশিষ্ট্য

৮.৬ অনুশীলনী

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ মানকুমারী বসুর কবিতা

মানকুমারী বসু উনিশ শতকে উনিশ শতকের খ্যাতনাম্নী মহিলাকবি ছিলেন। ইনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইনি দীর্ঘজীবনের অধিকারিনী (১৮৬৩-১৯৪৩) ; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের শোকতাপে যৌবনেই

চরম নিঃসঙ্গাতা পেয়েছিলেন ও চিরদিনের একাকিনীর জীবনবরণে বাধ্য হয়েছিলেন। এঁর কবিতাবলীতে স্বভাবতই ফুটে উঠেছে এক বেদনা ও বিষাদের সুর, যার মূল অনেকটাই ব্যক্তিজীবনের মধ্যে নিহিত ছিল। পাশাপাশি ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কবিপ্রতিভা, মহিলাকবির স্বভাবই অন্তর্মুখিনতার সঙ্গো লিরিক কবিতার রোমান্টিক কবিতার বিষাদচেতন মিলে এঁর কাব্যকবিতাকে এক বিশিষ্ট আস্বাদ দিয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে আধুনিক বাংলা লিরিকের জন্মলগ্ন বলতে পারি। ইংরেজি সাহিত্য ও সভ্যতার প্রভাবে এই সময় বাঙালি মানসে অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ম হয়। একদিকে ছিল আশাপূরণের বিপুল প্রত্যাশা অন্যদিকে বাসনাবৈকল্যের ব্যর্থতাবোধ ও তীব্র ক্রন্দন। মাইকেল মধূসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতায় এর বিখ্যাত উদাহরণ আছে—

মুকুতাফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস, পামর।
ফিরে দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহকজালে ?

যুগের পথিকৃৎ রোমান্টিক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এই বিষণ্ণ আত্মবাদকেই প্রকাশ করেছেন নিম্নলিখিত ভাষায়—

প্রাণে সহেনা না সহেনাক আর !
জীবনকুসুমলতা কোথারে আমার !
কোথা সে ত্রিদিব জ্যোতি,
কোথা সে অমরাবতী,
ফুরালো স্বপনখেলা সকলি আঁধার !

মানকুমারী বসু-র' 'একা' স্বরূপে অন্তর্মুখী গীতিকবিতা, তার সুরটি রোমান্টিক বিষাদের। সেই বিষাদকে পরিপুষ্ট করেছেন জীবনের বাস্তব দুঃখযন্ত্রণা। 'একা' কবির ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কবিতাগ্রন্থের অন্তর্গত। তারো আগে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গাসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রসূন' প্রভৃতি বই এর ভিতর দিয়ে বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার সুরটি স্বপ্রতিষ্ঠ হয়।

গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিপুরুষই প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই কবিতা "আত্মবাবনামূলক, মানবমনের একান্ত অনুভূতির বাহক।" ভাবাবেগ ও প্রকাশ দুইই গীতিকবিতার পক্ষে প্রয়োজনীয়। আবেগ ও ভাষার আন্তরিকতা গীতিকবিতার পক্ষে জরুরি। সেখানে থাকবে একধরনের নমনীয়তা ও কোমলতা। পাশ্চাত্য কাব্যের সঙ্গো সাক্ষাত পরিচয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এই কবিতার উদগতি।

M.H. Abrams 'A Glossary of Literary Terms' এ লিরিক বা গীতিকবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন— "a lyric is any fairly short poem, consisting of the utterence by a single speaker, who expresses a state of mind or a process of perception, thought and feeling" গীতিকবিতা অবয়বে হ্রস্ব, এখানে

কবির বিশেষ মনোভঙ্গি ও অনুভূতিই প্রকাশিত হয়ে থাকে। মানকুমারী বসুর একা কবিতায় আত্মঅনুভূতির সরল প্রকাশ ও নির্মাণই রয়েছে।

মানকুমারী বসু-র 'একা' কবিতায় রয়েছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও ব্যক্তিগত বিচ্ছেদবোধ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ', বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সহে না আর প্রাণে', গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'কোথায় যাই', মানকুমারী বসুর সাধ, একা, হতাশে, এই কি জীবন ? কামিনী রায়ের 'দিন চলে যায়', অক্ষয়কুমার বড়ালের হৃদয়শঙ্খ ইত্যাদি কবিতাকে বিষাদমূলক গীতিকবিতা বলেই চিহ্নিত করা যায়। বিষাদ ছাড়া একালে প্রেম দেশপ্রেম-গার্হস্থ্যজীবন-প্রকৃতি-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়েও গীতিকবিতা লেখা হয়েছিল।

"গতশতকের বিষাদকবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য-মহিলা কবিদের কবিতার বিষণ্ণ সুর। তাহাই মহিলা কবিদের রচনার প্রধান সুর। গতশতেকের মহিলারচিত কাব্য প্রায় গোটাটাই উৎসারিত হইয়াছে, কোনো শোকবিধুর সান্ধ্য উপত্যকা হইতে। মহিলা কবিদের ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতাই ইহার মূল। জীবনের শোকতাপ ইহাদের কবিতায় একটা অকপট আন্তরকিতা দান করিয়াছে। রূপকর্মে ও কাব্যপ্রসাধনে দক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকতার জোরেই হৃদয়াবেগকে ইহারা সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা—ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন।) সমালোচকের এই মন্তব্যের আলোকে মানকুমারী বসুর 'একা' কবিতাটির যথার্থ নিরূপণ করা যায়। এ কবিতায় একদিকে রয়েছে রোমান্টিক কবিদ্বয়ের স্বাভাবিক বেদনার সুর অন্যদিকে রয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের অভিঘাত। নিঃসঙ্গতা শুধু কাব্যিক নয় বাস্তবও।

'একা' কবিতায় যে কবিকে আমরা দেখছি তিনি রূপকর্মে ও কাব্যপ্রসাধনে কিছুটা ঢিলেঢালা। এই প্রবণতাটা ঊনিশ শতকের অপ্রধান বা গৌণ গীতিকবিদের প্রায় সকলরেই ছিল। অতএব 'একা' কবিতার প্রথম স্তরকে যে, বিস্তৃতি পাচ্ছি তার মূল্য প্রকাশনৈপুণ্যের জন্য নয় বরং আন্তরিকতার জন্য। মানকুমারী বক্তব্য কিছুটা সাদামাটা, ভাষাও কিন্তু সব মিলিয়ে একটা অসহায় বিষণ্ণ ব্যথিত আবেদন পাঠকের মন স্পর্শ করে। মানবজীবনকে তিনি ট্র্যাজেডি বলেই মনে করতেন। এই কবির বাণী নিরাভরণ হলেও সরল। উদাহরণ দিচ্ছি 'সাধ' কবিতার প্রথম স্তবক থেকে—

মানবজীবন ছাই বড় বিষাদের
দুটো কথা না কহিতে,
দুটি বার না চাহিতে।
আপনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানবজীবন ছাই বড় বিষাদের।

জীবনের অর্থহীনতা কবির কাছে শুধু দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে নয়, বাস্তব তথ্য হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। 'একা' কবিতার শুরু কবিমানসের মূল বিষণ্ণতার সুর ও রিক্ততার অনুভব দিয়েই শুরু হয়েছে। কবির একাকিত্বের মূলে রোমান্টিক কবিসুলভ জীবনবিষাদের পাশপাশি যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডি। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত "সাহিত্যপাঠকচ্চরিতমালা"-র অন্তর্গত 'মানকুমারী বসু' নামক পুস্তিকাটি পড়লে কবির কবিতায় তাঁর জীবনউপাদান কীভাবে প্রাধান্যবিস্তার করেছে জানা যায়। নবযৌবনাই বৈধব্যবেদনা আক্রান্ত মহিলা কবি তাঁর কবিতার প্রথম স্তবকেই নিজের বিধিবঞ্চিত ভাগ্য ও নিঃসঙ্গতার অশ্রুময় উল্লেখ করেছেন—

একা আমি, চিরদিন একা
সে কেন দু'দিন দিল দেখা ?
আঁধারে ছিলাম ভালো

কেন বা জ্বলিল আলো ?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা !
ভুলে ভুলে ভালোবাসা
ভুলে ভুলে সে দুরাশা
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা ?

কিন্তু মানকুমারী বসুর বিষাদচেতনা তাঁকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে, তাঁর লেখিকাজীবনের মূল দর্শন তিনি এই নিঃসঙ্গ বিষাদ ও রিক্ত বিড়ম্বনার কাছ থেকেই শিখেছেন। স্মৃতিকেই তিনি অমূল্য সম্পদ বলে আঁকড়ে ধরেছেন। স্মৃতিই হয়েছে তাঁর কবিতার বিষয় এবং জীবনের মূলতত্ত্ব সুখদুঃখের ক্রমাবর্তন এই মহিলাকবি জীবনবেদনার কাছ থেকেই শিখেছেন—

একা আমি চিরদিন একা,
তুব সে দু'দিন দিল দেখা।

নিঃসঙ্গ দীর্ঘজীবন তিনি নীরবে বরণ করেই নিয়েছেন, কারণ তিনি জানেন অন্তর্হিতের তপস্যা করে জীবন কাটানোই তাঁর ললাটলিপি এবং এভাবেই তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন এক সুখদুঃখ মন্থনকারিণী জীবনসাধিকা—

তারি লাগি বসুন্ধরা
হাসিভরা কান্নাভরা
জীবনের মূলতত্ত্ব তারি কাছে শেখা

—এখানে কবি বাস্তববিষাদকে শূন্য তিক্ততার হাত থেকে উদ্ধার করে নিখিল বেদনার সঙ্গে যুক্ত করে জীবনের সেই মূলতত্ত্ব সংলগ্ন করে শিখলেন উত্তরণ। এভাবেই ব্যক্তিগতকে বিস্তারে নিয়ে এলেন। এই বিস্তার অবশ্যই আত্মগত থেকে বিশ্বগতে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া।

কবি বুঝেছেন জীবনের গান তাঁকে একাই রচনা করে যেতে হবে। যুগলের জীবনস্রোত এ জন্মে তাঁর পাওয়া হ'ল না।

একা আমি এ অবনীতলে
কেহ নাহি 'আপনার' বলে,
একাই গাহিব গীতি
একাই ঢালিব প্রীতি
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে

তার ট্র্যাজেডি এই, যে সঙ্গী চলে গেছে তাকে তিনি ভুলতে পারেন না। বস্তুত বিচ্ছেদই হয়ে উঠল তাঁর কাব্যের বিষয়। 'একা' কবিতায় এই ব্যক্তিত বিচ্ছেদের সুর মানুষের নিয়তি চিরন্তন বিচ্ছেদের বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গীতিকবিতার জন্ম দিয়েছে। এ কবিতার রোমান্টিকতার মূল উৎসও এখানে।

সে কেন পরাণে আসে
সে কেন মরমে ভাসে
কেন ছোটে তারি ঢেউ মরমের তলে !

এই ব্যক্তিগত বেদনাগাথা বাঙ্ময় ও আন্তরিক। কিন্তু এখান থেকেই তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, চেষ্টা করলেন সুখদুঃখ নিরপেক্ষভাবে বেদনার সৃষ্টিলোকে প্রবেশ করার।

একা কবিতায় ঊনিশশতকের এক প্রতিভাবান মহিলা কবি তাঁর বেদনাবঞ্চিত ভাগ্যকে, তাঁর সংসার ট্রাজেডিকে কাব্যে প্রকাশ করেছেন। বসন্ত-বর্ষা-শীত এসেছে ও গিয়েছে কিন্তু তারা দিতে পারেনি অন্তরঙ্গ সখ্য। একার ভুবনে ফুলের ফুটে ওঠা ও কোকিলের ডাক ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। পৃথিবীতে একা আসা ও একা যাওয়াই নিয়তি। স্নেহ মমতার কাঙালিনী হয়েও যে রমণী কবি কিছুই পান নি, তিনি জানেন তিনি একদিন চলে যাবেন। সেদিন তাঁর চিরনৈঃসঙ্গ ঘুচবে। ভাগ্যের কাছে তাঁর শুধু এই অভিযোগ—প্রিয় তার আপন হয়েছিল তবু সুখস্বপ্ন কেন অকালেই ভেঙে গেল।

এই জীবনবেদনা, দুঃখের সঙ্গে সংগ্রামের কাহিনি মানকুমারী 'হতাশে' কবিতাতেও আছে। একটা দার্শনিক সত্যে তিনি উপনীত হয়েছেন।

আমাদের যাহা যায় জনমের তরে
আসে নাকো কখনো ফিরিয়া।

কখনো অভিমানে মনে হয়েছে জন্মভূমির গ্রামনদী কপোতাক্ষী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সব জ্বালা জুড়ান। কিন্তু মানকুমারী বসু তবু শেষপর্যন্ত বাঙালি মানসে ঊনিশশতকের মহিলাকবি হয়ে, বিখ্যাত সাগরদাঁড়ি-জাত মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী এই পরিচয় নিয়েই বেঁচে রইলেন।

৮.২ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা : কবর-ই-নূরজাহান

ভূমিকা ঃ কবর-ই-নূরজাহান সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত প্রায় ৬ পাতার একটি দীর্ঘ কবিতা, স্বরবৃত্ত-দলবৃত্ত ছন্দে রচিত। ইতিহাস থেকে উপাদান ও সংকেত নিয়ে লেখা এই বিখ্যাত রোমান্টিক কবিতাটি কবির 'অভ্র-আবীর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'অভ্র-আবীর' প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। লাহোরের শহরতলীতে নূরজাহানের সমাধি দেখে কবির মনে ভাবোদয় হয়েছিল। এই কবিতায় সেই ভাবের স্বাক্ষর আছে।

৮.২.১ উৎস ও ইতিহাস

নূরজাহান-এর বাস্তব জীবনকাহিনিকে কবি এখানে ভাষা দিয়ে বরণ করেছেন। মুঘলযুগের ইতিহাসপাঠে এই কাহিনি জানা যায়। ভিনসেন্ট স্মিথ রচিত ইতিহাসগ্রন্থ 'An Advanced History of India' ও Cambridge History of India ইত্যাদি থেকে পাঠক সব প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। নূরজাহান অর্থ জগতের আলো। হুমায়ুন-পুত্র যুবরাজ সেলিম মেহেরুন্নিসা নামক কুমারীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাদশাহের যেহেতু এ বিয়েতে মত ছিল না, মেহেরুন্নিসাকে সুদূর বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেলিম তাঁর মানসীর কথা ভুলতে পারেননি। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন জাহাঙ্গীর তাঁর অনুগত কুতুবকে বর্ধমানে পাঠালেন। কুতুব অবশ্য শের আফগানের সঙ্গেই মারা পড়েছিল সংঘর্ষে। যাহোক মেহেরুন্নিসাকে দিল্লি পাঠানো হ'ল। পরবর্তী অধ্যায় সবারই জানা। তাঁর নতুন নাম হয় নূরজাহান অর্থাৎ জগতের আলো। এই অসাধারণ রূপসী ও বুদ্ধিমতী নারী জাহাঙ্গীরের যথার্থ জীবনসঙ্গিনী হলেন এবং রাজকার্যে তাঁকে সহায়তা করতেন।

৮.২.২ কাব্যপ্রেরণা

কবর-ই নূরজাহান কবিতায় ইতিহাসের কাঠামোর উপর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা ও কল্পনার রক্তমাংসলাবণ্য সঞ্চার করেছেন। অতীত ইতিহাস রোমান্টিক কবিদের কাছে প্রিয় বিষয়। কারণ রোমান্টিক

কবিরা কল্পনাকেই শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে মানেন এবং ইতিহাসকে কবিতার বিষয় করলে সেখানে যথেষ্ট কল্পনাক্রীড়ার অবকাশ মেলে। বস্তুত আলোচ্য কবিতায় কবি নূরজাহানের জীবন ইতিহাসকে আত্মগত কল্পনা দিয়ে মণ্ডিত করে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনার আধারে আবার নতুন করে পরিবেশন করলেন। অধিকন্তু এ কবিতায় বাড়তি পাওনা ভ্রমণরস কারণ পশ্চিমভারত ভ্রমণে গিয়ে কবি কবিতার প্রেরণাস্বরূপ এই দুর্লভ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন নূরজাহানের সমাধিক্ষেত্রে।

'আজ তোমারে দেখতে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান'—এই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি দিয়েই কবিতাটির শুরু। কবি ঐতিহাসিক রমণীকে 'মরুভূমির গোলাপফুল' ও 'ইরাণ দেশের শকুন্তলা' এই দুটি অভিধা বা বিশেষণ দিয়েছেন। ইরাণ নূরজাহানের মাতৃভূমি অন্যদিকে সেলিম তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন যেমন দুষ্মন্ত পড়েছিলেন শকুন্তলার প্রেমে। ইতিহাসচেতনার প্রকাশ আছে কবি যখন বলছেন সম্রাজ্ঞীর কবরে অন্ধকারে জোনাকির নড়াচড়া অথবা যখন বলছেন বিশ্বজয়ী জাহাঙ্গীরের পৃথিবী আজ নীরব। ইতিহাস চেতনার অর্থ সময়ের অমোঘতা সম্বন্ধে বোধ—রূপযৌবন ধনমানশক্তিদম্ভ কিছুই থাকে না—মৃত্যু একদিন সবকিছু গ্রাস করে। অন্যদিকে কবি নূরজাহানের রূপপ্রশস্তি করেছেন—''জাগ তুমি জাহান-নূরী আলোয় ভর দিক আবার', 'রতির মূরতিতে জাগ, অঙ্গা লভুক অনঙ্গা' ইত্যাদিতে উচ্চারণে সে কথা। বঙ্গীয় কবি এখানে যে রূপপিপাসা ও মর্ত-সৌন্দর্যের পথে ভ্রমণ করছেন তার এক পূর্ব পথিকৃৎ হচ্ছেন ওমর খৈয়াম—রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের কবি।

রূপতৃষিত, রূপকে সর্বইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবে আগ্রহী কবিতুল্য Sensuos বা রূপকামনামত্ত সেলিমের আবাস পাচ্ছি এ কবিতায়। 'রূপের আদর জানত সেলিম, রূপদেবতায় মানত সে', অথবা

রক্তসাগর সাঁৎরে এসে দখল পেল পদ্মটির
রূপের পাগল, রূপের মাতাল রূপের কবি জাহাঙ্গীর।

উদ্ধৃতিটি প্রথম পঙ্‌ক্তি শেরআফগান হত্যাবৃত্তান্তের ইঙ্গিত। বাদশাহের হুকুমে টাঁকশালে মোহরে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নূরজাহানের নামও লেখা হয়েছিল।

সেলিম বাদশাহ হয়েও মেহেরুন্নিসাকে ভুলতে পারেননি—'বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুলবনা'। প্রেম ও যুদ্ধে কিছুই অন্যায় নয় অতএব নারী লুণ্ঠিত হ'ল। বর্ধমানে পাশাপাশি শেরআফগান ও কুতুব-এর সমাধিতে ইতিহাস রক্তসাক্ষী হয়ে রইল। ক্রমে ক্রমে অবহেলার হারেম থেকে নিজ ব্যক্তিত্বগুণে নূরজাহানের স্থান হ'ল বাদশাহের খাস মহলে। ভারতবর্ষ-শাসনে নেপথ্যে সম্রাজ্ঞীর ভূমিকাই প্রধান হয়ে উঠল। কারণ সেলিমের প্রেমিকসত্তা প্রেয়সীর কাছে যথার্থই নতজানু। কিন্তু এ হেন শাহনশাহও আজ মৃত্যুর হাতে পরাজিত।

৮.২.৩ কবিতা-বিশ্লেষণ

কবর-ই-নূরজাহান-এ ইতিহাসবাস্তব ও কল্পনা মিশিয়ে নূরজাহানের যে চিত্র কবি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা অবশ্যই মর্মস্পর্শী। মরুকন্যা মেহেরুন্নিশা ছিলেন অতিসাধারণ ঘরের মেয়ে। তাঁর উত্থান সত্যিই অদ্ভুত। ক্রমে ক্রমে তিনি হ'লেন রূপেগুণে মোহিনী। নৃত্যগীতে, কবিতা রচনায়, তীরছোঁড়া ঘোড়ায় চড়ায় হলেন নিপুণ—

বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুশী দিলের খুসরোজে তার জীবনমরণ দুই বোঝে
খালি হঠাৎ ঘোমটা তোমার সরম-রাঙা মুখখানি
এঁকে গেল যুবার বুকে রূপবানী গো রূপবাণী।

—এই হ'ল প্রথম প্রেমের ইতিহাস। নিয়নিত তাঁকে শেরআফগানের বিবি করেছিল, কিন্তু কালক্রমে তিনিই হলেন ইতিহাসের নায়িকা অথবা চালিকা শক্তি। ধীরে ধীরে জাহাঙ্গীরের উপর তিনি বিশাল প্রভাব বিস্তার করলেন। মাত্র দুটি পংক্তিতে এই নারীর ব্যক্তিত্ব কবি সুন্দর ফুটিয়েছেন

তুমি গো সাম্রাজ্যলক্ষ্মী কর্মে সদা উৎসাহী ;

জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা নিয়ে করলে নারী বাদশাহী

নূরজাহানে সাধ্বীরূপটিও পাচ্ছি শাহাজাদা খুরম-এর প্ররোচনায় সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ-র নজরবন্দী বাদশাহের উদ্ধার কাহিনিতে—

বন্দীস্বামীর মোচনহেতু হ'লে এবার বন্দিনী

মহাব্বতের মুঠা শিথিল করলে ইরাণ-নন্দিনী,

'তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহাব্বৎ খাঁ যায় ভেসে'—বর্ণনা হিসেবে অনবদ্য।

কবর-ই-নূরজাহান শেষ পর্যন্ত ইতিহাস-দলিলকে অতিক্রম করে মানবিক দলিল হয়ে উঠেছে এবং শেষ দুটি স্তবকে সে গূঢ়স্বাক্ষর রয়েছে। কবির নিজস্ব ভাবব্যাখ্যাই এর মূলে এবং এভাবেই কবিতাটি সমকালীন আবেদনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই আবেদন অবশ্যই একটি চিরকালীন বার্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কাঁটাবন আজ ঘিরেছে রূপের রাণির সমাধিকে।

জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মীনার বাহার যায় ঝরি,

আজকে তুমি নিরাভরণ চিরদিনের সুন্দরী।

সাধারণ ঘরের মাটির কাছাকাছি একলা মেয়ে আজ পুনশ্চ একলা। 'আজকে তোমার বুকে পাথর, মাথায় পাথর, পাথর পায়'। আজ জাহাঙ্গীরের কবর য-উজ্জ্বল, কিন্তু নূরজাহানের কবর অবহেলিত।

সমাধির শিয়ারে একটি করুণ ফারসি শ্লোক আছে, সেই শ্লোকটির কাব্যানুবাদ শুধু কবি করেন নি, সে শ্লোকটিকে কবিতার মর্মকথা হিসেবে রেখেছেন—

গরীবগোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে

শ্যামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে

মাটির মেয়ে এভাবেই নম্র বিনতিতে মাটির কোলে ফিরে এলেন। জন্মমৃত্যুর মাঝখানে রইল শুধু রণরক্তসফলতার সফেন তরঙ্গ। "মোগলযুগের তিলোত্তমা—চিরযুগের সুন্দরী"-কে কবি ব্যতিতের দৃষ্টিতেই দেখলেন।

৮.২.৪ কাব্যগঠন : ভাষা ও ছন্দ

পরিশেষে বক্তব্য এ কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ণ আকারেই রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে পাঠকেরা ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র লিখিত 'সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ' বইটি দেখতে পারেন। কবির আত্মভাবনার আলোকে স্নাত বলে এ কবিতা গীতিকবিতা, তাঁর কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টির গুণে এ কবিতা রোমান্টিক কবিতা। স্বরবৃত্ত-কলাবৃত্ত-ছড়ার ছন্দ-শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ যে নামেই এ কবিতার ছন্দকে ডাকা যাক 'ছন্দসরস্বতী' কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নির্মাণ দক্ষতার পরিচয় এখানে রয়েছে—

	১/১১ ১	১/১ ১ ১	১/১ ১ ১	১/১ ১
৪ + ৪ + ৪ +৩	বিস্মরণী	লতার বনে	ঘুমাও মাটির	বন্ধনে
	১ / ১ ১ ১	১ / ১ ১ ১	১ / ১ ১ ১	১ / ১ ১
৪ + ৪ + ৪ +৩	গোরী ! তোমার	গোরের মাটি	রূপের গোপী	চন্দনএ
	১ / ১ ১ ১	১ / ১ ১ ১	১ /১ ১ ১	১ / ১
৪ + ৪ + ৪ +৩	সোহাগী ! তোর	দেহের মাটি	স্বামী সোহাগী	সিঁদূর গো
	১ / ১ ১ ১	১ / ১ ১ ১	১১ ১ ১	/ ১ ১ ১
৪ + ৪ + ৪ +৩	জীর্ণ তোমার	শ্রীহীন কবর	বিশ্বনারীর	শ্রীদূর্গ

ভাষার নৈপুণ্য ছন্দের নৈপুণ্য দুই-ই বেশ বোঝা যাচ্ছে। দলবৃত্তে হসন্ত শব্দের গুরুত্ব থাকে। এ কবিতায় হসন্ত শব্দের ভালো ব্যবহার আছে। অন্যদিকে তদ্ভব তৎসম প্রভৃতি শব্দের পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দের চমৎকার মিশ্রণও কবি ঘটিয়েছেন। জাহান-নূরী, মোহর, সুলতানা, জরীন গুল, খুসরোজ, বাদী, খাসমহল, পাঞ্জা, ঝাণ্ডা, কিস্মিমাৎ, মীনা, গরীবগোর, বুলবুল, চেরাগ—এই ধরনের শব্দ ব্যবহার প্রাসঙ্গিকভাবেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

'ধী-শ্রী ছটার ছত্র মাথায় ছত্রবতী সুলতানা' অনুপ্রাসের উদাহরণ। শব্দালঙ্কার ছাড়া অর্থালঙ্কারেরও সার্থক ব্যবহার আছে। যেমন—'তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহাব্বৎ খাঁ যায় ভেসে'—অতিশয়োক্তি। এ কবিতায় শেষপর্যন্ত তথ্য, আঙ্গিক, স্তবকনির্মাণ—মোট ১১টি স্তবক, মিলব্যবহার-পরপর পঙ্‌ক্তিতে মিত্রাক্ষর—সব ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে কবিতার সরসতা। কবি নূরজাহানের একটা চমৎকার জীবন্ত মূর্তি মৃত্যুলোক থেকে উদ্ধার করে এনে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন—

বাদশার উপর বাদশা হলেন বাদশা হলেন তোমান বশ,
অফুরান যে স্ফূর্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটিতেই সব কথা বলা হয়ে গিয়েছে।

"বিশের শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রভাবের বহুচিহ্নময় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে গীতিকবিতাই ছিলো প্রধান আকর্ষণ। সত্যেন্দ্রনাথের সাধনার বিষয় ছিলো প্রধানতঃ এই গীতিকবিতা" (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ : ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র)। কবর-ই-নূরজাহান গীতিকবিতা হিসেবে এর অন্তর্লীন কাহিনিসংকেত অবশ্যই উৎকর্ষের দাবি করতে পারে।

৮.৩ নজরুল ইসলামের কবিতা : বিদ্রোহী

ভূমিকা : নজরুল প্রতিভার বৈশিষ্ট্য : নজরুলের ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত কবিতা, 'অগ্নিবীণা' কাব্যের অন্তর্গত, ১৩২৮ সালের মাঘমাসে কলকাতায় রচিত। নজরুলের কবিতার মূল সুর এখানে সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে : গীতিকবিতার যে সর্বোচ্চ স্তর আবেগের যে চরম চূড়া ভাষার যে মহৎ ঐশ্বর্য কবিতাটি স্পর্শ করেছে তার সঙ্গো একমাত্র তুলনা হতে পারে কবির লেখা 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' ও 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাদ্বয়ের। বিদ্রোহী কবিতা পড়লে বোঝা যায় ভাবের দিকে রবীন্দ্রউত্তর বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুনত্ব নিয়ে এসেছেন ; ছন্দে ভাষায় তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকার বর্তেছে, কিন্তু ভাবে তিনি স্বতন্ত্র। শব্দব্যবহার, ছন্দচেতনা ইত্যাদিতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে অল্পস্বল্প প্রভাবিত করেন ; রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তাঁর প্রিয় কবি কিন্তু কাব্যপথে নজরুলের বিচরণ ভিন্ন মার্গে। তাঁকে অবশ্য আমরা এক

পরবর্তী রোমান্টিক বলেই চিহ্নিত করতে পারি ; সোচ্চার আত্মঘোষণা ও আত্মবাদ এবং কিছুটা 'হাঁকডাকচীৎকার' অথবা কোলাহল-মুখরতার কারণে Byron ও Whitman-এর সঙ্গো তাঁর তুলনা দেয়া যায়। এক কথায় তিনি দুর্ধর্ষ জীবনপিপাসা ও জীবনআবেগের কবি। রোমান্টিকদের কুলগুরু রুশো বলেছেন "Man is born free, bt everywhere he is in chains" (মূল ফরাসি উক্তির ইংরেজি অনুবাদ)—মানুষ মুক্ত হয়ে জন্মেছে কিন্তু সে সর্বত্র শৃঙ্খালিত। আর নজরুলও যেন এই কথাটি জোরালোভাবে বলতে চেয়েছেন—তাঁর সমগ্র কবিতায় রয়েছে একটা শিকলভাঙার সাধনা, একটা বন্ধনমুক্তির তপস্যা। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতার মধ্যবর্তী স্তরটি অবশ্যই তাঁর কবিতায় দেখা যায়।

৮.৩.১ 'বিদ্রোহী' রচনার পশ্চাৎপট

মুজফফর আহমগ রচিত 'কাজি নজরুল ইসলাম—স্মৃতিকথা" (প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সী) কবির সেরা জীবনী, অন্যদিকে তাঁর কাব্যকবিতা নিয়ে সেরা আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তাঁর বইটিতে। বিদ্রোহী কবিতার পূর্বাপর রচনার ইতিহাস মুজফফর আহমেদ লিপিবদ্ধ করেছেন। বিদ্রোহী কবিতাটি নজরুল ইসলাম লিখেছেন ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সময়ে বড়দিনের ছুটির সময়ে। কবি মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গো এইসময় তাঁর যোগাযোগ ছিল। পরে অবশ্য উভয়ের সম্পর্ক ভেঙে যায়, নজরুল মোহিতলালের গুরুগিরির আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। যাহোক 'বিদ্রোহী' নজরুল লিখেছিলেন কমরেড মুজফফর আহমদ-এর ৩/৪সি তালতলা লেনের ভাড়াবাড়িতে। একতলায় নজরুলও তাঁর সঙ্গেই সেখানে একসাথে থাকতেন। 'সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এসে আমি বসেছি, এমন সময় নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনাল। "বিদ্রোহী" কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা'—স্মৃতিকথা থেকে এই তথ্য জানা যায়। 'বিদ্রোহী' প্রথম ছাপা হয় সাপ্তাহিকী 'বিজলী'তে। 'বিদ্রোহী' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিল। কবিতাটি প্রকাশমাত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় এবং নজরুলের কবিখ্যাতি এক লাফে বেড়ে যায়। মোহিতলাল অবশ্য মনে করেছিলেন তাঁর "আমি" বলে পদ্য লেখাটির 'ভাব চুরি' করে নজরুল তাঁর কবিতাটি লেখেন। কথাটা অবশ্য সত্যি নয়। নজরুল 'আমি' থেকে তার লেখার idea টা হয়তো পেতে পারেন। 'আমি' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"আমি বিরাট...আমি ক্ষুদ্র...আমি সুন্দর...আমি ভীষণ...আমি মধুর...আমি ম্যাডনাবক্ষে নিমীলিত নয়ন স্তনন্ধয় শিশু...আমি আনন্দ...আমি রহস্যময়, আমি দুর্জ্ঞেয়...আমি মৃৎপঞ্জল...আমি সৃষ্টিগ্রন্থের প্রহেলিকা...আমি দুর্বল অসহায়...আমি মূর্খ, আমি নির্বোধ...আমি উন্মাদ"—ইত্যাদি।

আর নজরুল লিখেছিলেন—

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বী !
আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়মকানুন শৃঙ্খল।

বস্তুত 'বিদ্রোহী'কে নজরুলের কবিআত্মের, তাঁর নিজস্ব 'আমি'-র জয়পতাকা বলা যায়। কিন্তু একথা বলা যায় না তিনি মোহিতলালের নকল করেছেন। কবিতার ideaটা হয়তো মোহিতলালের 'আমি' পড়ে তাঁর মাথায় আসতে পারে সাহিত্যে এমন ব্যাপারই স্বাভাবিক ও সবসময় ঘটে।

৮.৩.২ কবিতা বিশ্লেষণ : ভাববস্তু

বিদ্রোহীতে রোমান্টিকের উচ্ছৃঙ্খল আত্মঘোষণা শিল্পের শাসনে বাঁধা পড়েছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিদুটির সূচনা থেকেই কবিতাটি পাঠকের মন কেড়ে নেয়। এ কবিতা যেন এক আত্মপ্রেমিকের মায়াদর্পণ, এক নার্সিসাসের আত্মজীবনী।

আমার উচ্চশির দেখে হিমাদ্রিচূড়া মাথা নত করে। আমি বিশ্ববিধাতার বিস্ময়, আমার ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে ওঠেন, সেখানে জয়জয়শ্রীর রাজটীকা। আমি নিয়ম মানি না, আমি টর্পেডো ও মাইন-এর মতো ধ্বংসাত্মক, আমি ধূর্জটি, আমার চুলে বৈশাখী ঝড়, আমি বিদ্রোহী, আমি সবকিছু চূর্ণ করি ঘূর্ণিরূপে। 'আমি নৃত্যপাগল ছন্দ', 'আমি মুক্ত জীবনানন্দ', 'আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল' ; 'আমি চল চঞ্চল' ; আমি মন যখন যা চায় তাই করি ; আমি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ি, 'আমি উন্মাদ' ; আমি মহামারি, আমি পৃথিবীর ভীতি, আমি সংহার, আমি উষ্ণঅধীর—এ ভাবেই কবি নজরুল বিদ্রোহী কবিতায় আত্মবীজমন্ত্র সোচ্চারে জপ করেছেন।

৮.৩.৩ রোমান্টিক আবেগ উচ্ছ্বাস

শব্দপ্রয়োগ তৎসম-দেশী-বিদেশী-ধ্বন্যাত্মক শব্দের মিশ্রণে তিনি কৃতিত্ব দেখান, বাংলা শব্দের সঙ্গো সহজাত প্রতিভায় আরবি ফারসি মিশিয়ে নতুন কাব্যবাণীর জন্ম দেন। পথিকৃৎ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। উদাহরণ দিচ্ছি—

আমি চিরদুরন্ত দুর্মদ
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।

কবি একই সাথে হোমশিখা ও সাগ্নিক, যজ্ঞ ও যজ্ঞপুরোহিত ; সৃষ্টি ও ধ্বংস ; তিনি নীলকণ্ঠ বিষপানে, শিরজটায় জাহ্নবীকে তিনিই জটায় ধারণ করেন। নজরুল মিথোলজি বা পুরাকাহিনি থেকে সাবলীলভাবে উপমা তুলনা প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য'—অবশ্যই মনজয় করা উচ্চারণ। এখানে কবির সংগ্রামী ভূমিকার ইঙ্গিত।

বিদ্রোহী কবিতায় কবি 'কবিসত্তার স্বাধীনতাকেই ঘোষণা করেছেন। এখানে ইংরেজ কবি Lord Byron আমেরিকান কবি Walt Whitman প্রভৃতির সঙ্গো তাঁর তুলনা চলে।

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।

—আত্মপূজারির এই দর্পিত বাক্য শুধু উচ্চারণ হিসাবেই চমৎকার নয়, শব্দের সাবলীল ব্যবহারেও প্রেরণার অনিবার্য জয়যাত্রাকে দেখিয়েছে। রোমান্টিক আবেগ উচ্ছ্বাসের এক তুমুল দর্পিত ব্যবহারই এখানে দেখা যাচ্ছে। 'আমি'-র মহাশক্তি সম্বন্ধে সচেতনতাই 'বিদ্রোহী' কবিতার মূল সৌন্দর্য, পদে পদে বিস্তক আবর্ত রচনা করেই কবি ভাবসিদ্ধির পথে এগোচ্ছেন। শব্দগত Contrast বা বৈপরীত্ব এ কবিতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য—'আমি প্রাণখোলা হাসি উল্লাস—আমি সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস,' 'আমি কভু প্রশান্ত—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী' ইত্যাদি অজস্র পঙ্‌ক্তি ও শব্দব্যবহার মনে পড়ে। ego বা অহং এর এমন নিরঙ্কুশ জয়যাত্রা নীটশে-বিরচিত Thus spake Zarasthustra গ্রন্থে কিছু দেখেছি।

নজরুল প্রেমের কবি, তিনি চারু সুকুমার হৃদয়ানুভূতির কবি, কোমল মনোরম হার্দ্য শব্দমালার কবি, কবিতায় অপূর্ব মদালস বিলাসবিভ্রময় মায়াবী প্রতিবেশ রচনা করতে পারেন। সেখানে মাধুর্যের হাত ধরে এসে দীপ্তি, লাবণ্যের হাত ধরে তেজ। নিম্নে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে তার প্রমাণ রয়েছে—

আমি অভিমানী চিরক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর,
আমি গোপনপ্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কনকন !

বোঝা যায় গীতিকবিতার সৌন্দর্য নির্মাণক্ষমতা কবির আয়ত্তে ছিল, জীবনের রুদ্রভীষণ বিস্ফোরক দিকগুলির যেমন তিনি সাগ্রহী রূপকার তেমনি আবার জীবনের মধুর কোমল সুললিত দিকগুলিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। 'বিদ্রোহী' তথা সমগ্র নজরুলকাব্যে এই রুদ্র ও মধুরের বিপরীত সমাবেশ আছে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি এই যে কবিত্বের অলৌকিক চূড়া স্পর্শ করেছেন তার একমাত্র তুলনা দোলনচাঁপা কাব্যের 'আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' কবিতাটি এবং তুলনা রয়েছে তাঁর গানগুলিতে সেগুলি আমরা যখন কবিতারূপে পড়ি।

আজি সৃষ্টিসুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে

—এ উদ্ধৃতি পূর্বোক্ত কবিতাটি থেকে।

৮.৩.৪ বায়রন ও হুইটম্যানের সঙ্গে তুলনা

নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে সমালোচকেরা বায়রন ও ওয়াল্টহুইটম্যানের নামে করেছেন। Lord Byron লিখেছিলেন

Hereditary Bondsmen! Know ye not
Who would be free themselves must strike the blow?
(Childe Harold's Pilgrimage)

মুক্ত হতে গেলে আঘাত হানতে হয়, বংশানুক্রমিক ক্রীতদাসত্ব যারা করে একথা তাদের অজানা। এবং পুনশ্চ

I have not loved the world, nor the world me;
I have not flattered its rank beneath, nor bow'd
To its idolatries a patient knee

আমি পৃথিবীকে ভালোবাসিনি, এবং পৃথিবীও আমকে ভালোবাসেনি। আমি তোষামোদ করিনি, নতজানুও হইনি।

বায়রনের কবিভাবনার পাশাপাশি স্থাপন করা যায় নজরুলের কবিভাবনাকে। বিদ্রোহী কবিতায় পুরোনো নিয়ম কানুনকে ভেঙে ফেলার প্ররোচনা আছে—"আমি ভেঙে করি চুরমার', "আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল" ইত্যাদি কথায় সেই ইঙ্গিত। আর নিজের বিশ্ববিদ্রোহী খরদীপ্ত স্বাতন্ত্রের জয়গান রয়েছে, "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ" বা "আমি চির-বিদ্রোহী বীর / আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চিরউন্নত শির।" প্রভৃতি উচ্চারণে।

ওয়াল্ট হুইটম্যান ছিলেন এক সতেজ জীবনতৃষ্ণা ও মানবতার কবি। এই মানবতার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আত্মবাদ। 'I celebrate myself, and sing myself' —আমি নিজেকে নিয়ে উৎসব করি, নিজেকে নিয়েই গান গাই অথবা 'And nothing, not God, is greater to one than one's self is'—কোনো কিছুই, এমনকী ঈশ্বর পর্যন্ত একজন মানুষের আত্ম বা ব্যক্তিগত সত্তার চেয়ে বড় নয়—Leaves of Grass কাব্যের এইসব বাণী বহু পাঠকেরই পরিচিত। বিদ্রোহী কবিতাটির স্তরে স্তরে ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে এই ব্যক্তিগত সত্তার

বন্দনা, মানুষের individuality বা মুক্ত ব্যক্তিত্বের জয়গান। গীতিকবিতার, বিংশশতকের কবিতার এই এক প্রধান লক্ষণ। হুইটম্যানের পাশাপাশি এক নিঃশ্বাসে পাঠ করা যায় নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি অথবা অংশ। 'আমি মহাবিশ্বের মহাকাশ কাড়ি/...উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাতৃর', 'আমি বিশ্বতোরনে বৈজয়ন্তী, মানববিজয় কেতন' ইত্যাদি নজরুলীয় পঙ্‌ক্তিগুলি অবশ্যই মনে পড়বে এ প্রসঙ্গে।

৮.৩.৫ দেশবিদেশের পুরাণব্যবহার

বিদ্রোহী কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য এখানে কবি দেশবিদেশের মিথোলজি বা পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ব্যবহার করেছেন। ধূর্জটি কামদগ্নি, ইন্দ্রাণী, গঙ্গোত্রী, দুর্বাশা, বিশ্বামিত্র, উচ্চৈঃশ্রবা, বাসুকি, বিষ্ণু, চণ্ডী, শ্যাম, পরশুরাম ইত্যাদি এসেছে সংস্কৃত পুরাণ থেকে। আবার বোরবাক, দোজখ, জিব্রাইল, ইস্রাফিল ইত্যাদি এসেছে আরবি পুরাণ থেকে। বোররাজ স্বর্গের পক্ষীরাজ, দোজখ নরক, জিব্রাইল প্রভৃতি দেবদূত। আবার কবি যখন বলেন—'আমি অর্ফিসাসের বাঁশরী' তখন তিনি greek Mythology-র Orpheus-এর কথা বলেন যিনি ছিলেন সঙ্গীতযন্ত্রবাদক, মৃত্যুলোকে গিয়েছিলেন স্ত্রী ইউরিডিকে-কে ফিরিয়ে আনবেন বলে।

৮.৩.৬ উপসংহার

বিদ্রোহী কবিতাটি শেষ স্তবকদুটিতে একটি অনন্ত climax এ পৌঁছেছে।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন

এই অসাধারণ উচ্চারণে রেনেসাঁসের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুক্তিসাধক যত বিদ্রোহী বিপ্লবী মানুষের মর্মকথা আছে। এই মানুষ Iconoclast বা দেবদ্রোহী, প্রথাবিরোধী, সর্বদা স্রোতের বিরুদ্ধে ও প্রতিবাদী চরিত্র। এই মানুষ সক্রেটিস, শেলী, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ান, রুশো বা নীটশের মন জন্ম বিদ্রোহী জন্মবিপ্লবী। আর একটু আগেই নজরুল বিদ্রোহী কবিতায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চারণটি সমাপ্ত করলেন—

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোলে আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবেনা—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

এখানে humanist কবির মানবতাবাদ বা বিদ্রোহী কবিতার মূল সৌন্দর্য আবেগমথিত ভাষায় প্রকাশিত। এখানে আমরা সর্বহারার কবিকে পেলাম। কাব্যের এই সমুচ্চ চূড়া কবি আরো একবার স্পর্শ করেছিলেন তাঁর 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'এ। রোমান্টিক কবি তাঁর মানবতাবাদের কারণেই কল্পনার আকাশে ডানা মেলেও মাটির পৃথিবীতে শিকড়সংসক্ত থাকতে পারেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল এই চিরন্তন সত্যকে আরও একবার প্রমাণিত করলেন। শেলীর 'পশ্চিমী ঝড়ের' মতোই তিনি হয়ে উঠলেন নতুনের পথিকৃৎ।

৮.৪ মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা : কালাপাহাড়

ভূমিকা : কালাপাহাড় মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। মোহিতলালের জন্ম ১৮৮৮ সালে, তাঁর পিতা ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের জ্ঞাতিভ্রাতা। বি.এ. পাশ করে তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ও আইন পড়তে শুরু করলেও সে কাজ অসাপ্ত রাখতে

হয়েছিল। অধ্যাপক ডঃ সুশীলকুমার দে-র সঙ্গে ছাত্রজীবনে কবির বন্ধুত্ব হয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট সুশীলকুমার পরে মোহিতলালকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক করে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে তিনি সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত শনিবারের চিঠির সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল' ও 'হেমন্তগোধূলি' তাঁর কাব্যগ্রন্থ এবং কবি শ্রীমধুসূদন, সাহিত্যবিতান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বঙ্কিমবরণ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বাংলা কবিতার ছন্দ, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, রবিপ্রদক্ষিণ ইত্যাদি তাঁর সমালোচনাগ্রন্থ। কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে মোহিতলালের স্থানটি সুনির্দিষ্ট অন্যদিকে বাংলাসমালোচনা সাহিত্যের তিনি একজন আদি পথিকৃৎ। ইংরেজি সাহিত্যে ও ইংরেজি সমালোচনাসাহিত্যে পারঙ্গম মোহিতলাল কবি অধ্যাপক ম্যাথু আর্নল্ড, সমালোচক মিডলটন মারি প্রভৃতির ভক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনাকে তিনি সৃষ্টিধর্মী আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যান ও তাকে উৎকর্ষে ইংরেজি সমালোচনার সঙ্গে একাসনে বসানোর পক্ষে উপযুক্ত করে তোলেন। মোহিতলালের কবিতাকে বুঝতে গেলে তাঁর কবিতা সম্পর্কিত আলোচনাগুলিও পড়তে হবে কারণ সাহিত্যতত্ত্ব সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৮.৪.১ রবীন্দ্রবিরোধিতার সূচনা

কবি হিসেবে বাংলাসাহিত্যে মোহিতলালের ঐতিহাসিক অবস্থান 'কল্লোলযুগে'র লেখক অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে 'কবিতার বিচিত্র কথা'র গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র সকলেই লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রভাববিস্তারী কবি। সেই সময়টাকে বলতে পারি রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের যুগান্ত। একদিকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি কবিরা রবীন্দ্রভক্ত রূপে পরিচিত পেয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের উচ্চ রোমান্টিকতাকে এঁরা সকলেই গ্রহণ করে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তরলীকরণ করে এরা পরিবেশন করছিলেন। ফলে এরা নতুন পথের সন্ধান দিতে পারছিলেন না। এঁদের বিপরীতে ছিলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতি আধুনিক কবিরা। এঁরা উদ্গত হয়েছিলেন রোমান্টিক কবিতা তথা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিত্রয়ের অবস্থান এই দুই দলের মধ্যে যোজক বা buffer হিসেবে। আধুনিক কবিরা ভাবে ভাষায় ছন্দে নতুনত্ব আনলেন—তাঁদের আদর্শ হলেন রবীন্দ্রনাথ নন, এলিয়ট প্রভৃতির মতো বিদেশী কবিরা। মোহিতলাল প্রভৃতি বর্ণিত কবিত্রয় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নতুনভাবের সন্ধানে ব্রতী হলেন যদিও ভাষা ও ছন্দে এখন এঁরা রোমান্টিক পথেই বিচরণ করেছেন। তবু এঁরাই বাংলা কবিতায় নিরবচ্ছিন্ন রবীন্দ্রপ্রভাবের বিরুদ্ধে প্রথম সাহিত্যিক বিদ্রোহী।

৮.৪.২ মোহিতলালের কবিতায় রবীন্দ্রবিদ্রোহ

মোহিতলালের রবীন্দ্রবিদ্রোহ 'মোহমুদ্গর'-এর একটি অবিস্মরণীয় স্তবকে রয়েছে—

ঊর্ধ্বমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকামাধবী
নেহারিয়া নীহারিকা ছবি—
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি নীরক্ত অধরে
উমহাসি দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে
বুভুক্ষু মানব লাগি রচি ইন্দ্রজাল
আপনা বঞ্চিত কবি চির ইহকাল
কতদিন ভুলাইবে মতর্জনে বিলাইয়া মোহন আসব
হে কবি-বাসব ?

‘কবি বাসব’ বলাবাহুল্য কবি-ইন্দ্র রবীন্দ্র। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি শুধুই এক কল্পনার ইন্দ্রধনুরঞ্জিত জগৎ সৃষ্টি করেছেন, বাস্তবজগতে এর কোনো মূল নেই। এ অভিযোগ অবশ্য ধোপে টেঁকে না কিন্তু মূল কথাটা এই যে মোহিতলাল-নজরুল-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মত কবিরা কাব্যে হয়ে উঠলেন এক নতুন পথের দিশারী এবং আধুনিক কবিতার নবভাবনার পূর্বাভাস এঁদের কবিতায় অল্পস্বল্প ফুটে উঠেছে।

৮.৪.৩ ‘কালাপাহাড়’ কবিতায় বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয়

মোহিতলাল মজুমদারের ‘কালাপাহাড়’ কবিতাটির আলোচনাপ্রসঙ্গে এ সব কথা মনে রাখা জরুরি কারণ ‘কালাপাহাড়’কে মূর্তিবিধ্বংসী বা Iconoclast রূপে কবি প্রায় প্রতীকী অর্থেই ব্যবহার করেছেন—তিনি নিজে কবিতার ভাবরাজ্যে পুরাতন মূর্তিবিধ্বংসী রূপেই আবির্ভূত হতে চেয়েছিলেন। এখানে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় ‘বিদ্রোহী’ কবিতার নজরুল ইসলাম। ইংরেজ রোমান্টিক কবি Shelley কে বলা হয়েছে Iconoclast বা মূর্তি-ধ্বংসী বিদ্রোহীরূপে। তিনি এক millenium বা নতুন মানবপৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন—পুরাতন প্রথামাত্রিক সমাজকে ধ্বংস ও বিদীর্ণ করে এক নতুন মানববিশ্বের উদয় অভ্যুদয় হবে, সেখানে সব মানুষের সমান অধিকার থাকবে এই ছিল তাঁর কবিস্বপ্ন। মোহিতলাল, কালাপাহাড়ের ইতিহাস-সংকেতে এক নতুন মানবসমাজ ও পৃথিবীর উত্থানের আভাস দেখিয়েছেন—

শুনিছনা ওই দিকে দিকে কাঁদে রক্তপিশাচ প্রেতের দল!
শবভুক সব নিশাচর করে জগৎ জুড়িয়া কী কোলাহল!
দূর মশালের তপ্তনিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগনশিলা!
ধরণীর বুক থরথরি কাঁপে—এ কী তাণ্ডব নৃত্যলীলা।
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার?
মানুষের পাপ করিতে মোচন, দেবতারে হানি ভীমপ্রহার,
কালাপাহাড়!

অতএব ‘কালাপাহাড়’ হচ্ছে নতুন মুক্ত সমাজপ্রতিষ্ঠার এক catalyst বা অনুঘটক। সেখানে দেবতার নামে যথেচ্ছ অনাচার থাকবে না, মানুষের উপর অত্যাচার থাকবেনা ইত্যাদি। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে শেলির Ode to the West Wind কবিতার অমর পঙ্‌ক্তিরাজি—

Drive my dead thoughts
Over the Universe to quicken a new birth

পশ্চিমের আগত হে ঝড়, তুমি আমার মৃত চিন্তাকে ঝরাপাতার মতো উড়িয়ে দিয়ে এক নতুন পৃথিবীর আগমনকে ত্বরান্বিত করো।

৮.৪.৪ কবিতা বিশ্লেষণ

বিস্মরণী কাব্যগ্রন্থের সূচনায় অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার দে, ডি-লিট (লন্ডন), পি. আর. এস-কৃত যে ‘কাব্যআলোচনা’ আছে সেখানে ‘কালাপাহাড়’ কবিতাটির অর্থের দিকদর্শনী আলোচনা আছে। অধ্যাপক সুশীলকুমার বলেছেন, এইরূপ অনেক কবিতায় এই রূপমুগ্ধ আর্টিস্ট চেষ্টা করেছেন শুধু একটা ছবি আঁকতে—সেই ছবির মধ্যে ভাবটি ধীরে ধীরে দীপ্ত হয়ে আপনি ফুটে উঠেছে। তাঁর বাঁধন, মৃতপ্রিয়া, ঘুঘুরডাক, কন্যা শরৎ ও কালাপাহাড় এই শ্রেণির রচনা। এই সকল কবিতায় তাঁর উদ্দেশ্য একটি অবস্থা, একটি mood বা একটি atmosphere এর আলেখ্যসৃষ্টি। ইতিহাসবর্ণিত কালাপাহাড়কে উপলক্ষ্য করে কবি শুধু march of

the iconoclast এর একটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের জীবনে, সমাজে ও ধর্মে স্তূপাকার আবর্জনার মতো, যে সব প্রাণশক্তিবিরোধী অনাচার ও কুসংস্কার যাকে বেকন idol বা অসত্যের প্রতীক বিগ্রহ বলেছেন—

আদি হতে যত বেদনা জমেছে বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—

সেই সমস্ত পুঞ্জীভূত অসত্য ও অপমান এই বিগ্রহধ্বংসী কালপুরুষের মতো নির্মম, অসত্যদেবতার চিরন্তন শত্রুর করালদণ্ডের আঘাতে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে—

ভেঙ্গো ফেল মঠ মন্দিরচূড়া, দারুশিলা কর নিমজ্জন!
বলি উপাচার ধূপদীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন।
নাই ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে! মানুষের বুকে রক্ত চাই!

যা ভঙ্গুর তা ঝটিকার মুখে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু প্রলয়ের সঙ্গো সঙ্গো এই অপূর্ব ধ্বংসলীলার মধ্যে নবসৃষ্টির আয়োজনও রয়েছে—

ব্রাহ্মণযুবা যবনে মিলেছে, পবন মিলেছে বহ্নিসাথে!
এ কোন বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়রাতে!
মরুর মর্ম বিদারি বহিছে সুধার উৎস পিপাসাহরা!
কল্লোলে তার বন্যার রোল! কূল ভেঙ্গো বুঝি ভাসায় ধরা!
ওরে ভয় নাই! মুকুটে তাহার নবারুণছটা, ময়ুখহার!
কালনিশিথিনী লুকায় বসলে। সব দিল তাই নাম তাহার
—কালাপাহাড়।

ইতিকথার এইরূপ নূতন imagintive interpretation-এর চেষ্টা তাঁর 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' কবিতাতেও দেখা যায়।

বলাবাহুল্য মোহিতলাল ইতিহাস থেকে myth বা গল্প নিয়ে তাকে আধুনিক ভাবব্যাখ্যারূপে ব্যবহার করেছেন। কালাপাহাড় ইতিহাস যাকে মন্দির ধ্বংসকারী অত্যাচারী যবনরূপেই চিহ্নিত করেছে কবি তাকেই নতুন সমাজব্যবস্থা বা new social order-এর হোতা বা উদগাতারূপে দেখতে চেয়েছেন। বাংলার তুর্কী ইতিহাসে আছে এক হিন্দু যুবাই যবন হয়ে তার বিধ্বংসী কার্যকলাপের জন্য "কালাপাহাড়" আখ্যা পেয়েছিলেন। এ কাহিনির মধ্যে কতটা সত্যি কতটা মিথ্যা তা অবশ্য নিরূপিত হয়নি।

৮.৪.৫ কবিতার গঠন বিশ্লেষণ

কবি হিসাবে মোহিতলাল কল্পনাবিলাসী। আনন্দের পাশাপাশি বিষাদ তাঁর কবিতার একটা মূল সুর। ছন্দ ও ভাষার অপূর্বতা তাঁর কবিতায়। তিনি 'কল্পনাবিলাসী', 'ভাবপ্রাণ idealist'। তাঁর আদর্শবাদ তাঁকে subjective বা ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাববাদের সঙ্গো objective বস্তুবাদকে মেলাতে সাহায্য করে। মধুসূদন ও বঙ্কিমসমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি রোমান্টিকতাকে সম্পূর্ণ বর্জন না করেও classicism বা বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার ও শব্দের ভাস্কর্যময় সংগঠনের প্রতি সমর্থন দেখিয়েছেন। কালাপাহাড়ে ভাষা ও ছন্দের এই ভাস্কর্যময় সংগঠন কিছু আছে। কবিতাটি যাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্তে রচিত। ১২টি স্তবকে বিভক্ত। মিলবিন্যাস aabbccc, প্রতি স্তবকে ৭ পঙ্ক্তি। কালাপাহাড় শব্দটি ধূয়ারূপে সপ্তম পংক্তিতে সর্বত্র ব্যবহৃত, ওই পংক্তিতে শুধু এই একটি শব্দ রয়েছে। অন্যদিকে refrain বা ধ্রুবপদের ভঙ্গিতে স্তবক থেকে স্তবকান্তরে কোনো কোনো পঙ্ক্তি পুনরাবৃত্ত—যেমন ১ম ও ২য় স্তবকে "এতদিন পরে উদল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার?" ৮ম ও ১০ম পংক্তিতে 'ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙে যায়! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়' ইত্যাদি।

৮.৪.৬ বস্তুপ্রাণতা ও কল্পনাপ্রাণতার সমন্বয়

‘কালাপাহাড়ে’ রয়েছে কবিমনের বস্তুপ্রাণতা বা objectivity-র সঙ্গে কল্পনাপ্রবণতা বা Subjectivity-র মিলন। ইতিহাসের তথ্যবস্তুর সার্থক রূপায়ণ এখানে। আবেগের সঙ্গে রয়েছে সংযম, lyric বা গীতিময়তার সঙ্গে মিশেছে dramatic বা নাটকীয়তা।

ডঃ সুশীল কুমার দে যথার্থই বলেছেন, মোহিতলাল ছন্দকৌশল ও শব্দমন্ত্রে অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছেন। ‘নিরর্থক বাক্যাড়ম্বের বা কথা অসদ্ব্যবহার তাঁর অজ্ঞাত এবং শব্দের ঝঙ্কার বা ধ্বনি সম্বন্ধে তাঁর কান অভ্রান্ত। স্তবকনির্মাণে তিনি নিপুণ—এখানে তাঁর ক্লাসিক কবিসুলভ গঠননৈপুণ্য প্রকট। সুশীলকুমার যথার্থই বলেছেন, “রোমান্টিকভাবে অনুপ্রাণিত হলেও, নিখুঁত কারিগরি হিসাবে মোহিতলালের কবিতাগুলি ক্লাসিক আর্টের উৎকৃষ্ট “রোমান্টিকভাবে অনুপ্রাণিত হলেও, নিখুঁত কারিগরি হিসাবে মোহিতলালের কবিতাগুলি ক্লাসিক আর্টের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়। Concrete details বা খুঁটিনাটির দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ আছে বলেই শব্দচয়নের গাঢ়তা ও গৌরবে তাঁর কবিতার ভাবকল্পনা শাণোল্লিখিত হীরকখণ্ডের মতো পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতালাভ করেছে। বিদেশী কবিদের মধ্যে Landor ও Tennyson এর দেশী কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয় বড়ালের প্রভাবই তাঁর কবিতায় বেশি দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত কবির কাছ থেকে তাঁক শিক্ষা হয়েছে—শিল্পসৌন্দর্য, বিন্যাসনৈপুণ্য ও নির্মাণকৌশল।” সুইনবার্ন প্রভৃতি প্রিরাকেলাইট কবিদের সঙ্গেও মোহিতলাল প্রতিতুলিত হতে পারেন তাঁর কবিতার sensuousness বা ইন্দ্রিয়জ সংবেদনার কারণে। তাঁর সমালোচনার ভাষাতেই বলি, তিনি যেন “পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ” জ্বালিয়ে রূপসৌন্দর্যের আরতি করেছিলেন।

কালাপাহাড় কবিতায় একদিকে রয়েছে ভাষাব্যবহার-এর বিদ্যুতীচ্ছটা—

বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা—বাজে কী ভীষণ কাড়ানাকাড় !
অগ্নিপতাকা উড়িছে ঈশানে—ফুলিছে তাহাতে উল্কাহার !
অসির ফলকে অশনি ঝলকে—গলে যায় এত ত্রিশূলচূড়া !
ভৈরব রবে মূর্ছিত ধরা, আকাশের ছাদ হয় বা গুঁড়া !

এ কবিতায় অন্যদিকে রয়েছে ভাবের দিক থেকে নব্য মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা

ভেঙ্গে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া দারুশিলা কর বিসর্জন
বলি-উপাচার ধূপ দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন !
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান-ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে ! মানুষের বুকে রক্ত চাই।

—শেষ পঙ্‌ক্তিটিতেই সব কথা বলা হয়ে গেছে।

সাহিত্যবিতান গ্রন্থের ‘সাহিত্যবিচার’ প্রবন্ধে মোহিতলাল বলেছেন “এইজন্যই কাব্যসৃষ্টিতে Subjectivity বা মন্ময়তা অপেক্ষা Objectivity বা তন্ময়তাই কবিকল্পনার উৎকর্ষ প্রমাণিত করে।” মোহিতলালের ‘পান্থ’, ‘মোহমুদগর’, ‘কালাপাহাড়’ ইত্যাদি কবিতায় Subjectivity ও objectivity-র চমৎকার মিলন আমরা দেখছি, ব্যক্তি আমিকে কিছুটা পরিশোধন করে বস্তুগতভাবেই পরিবেশনের প্রয়াস লক্ষিত হচ্ছে।

৮.৫ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা : ঘুমের ঘোরে

ভূমিকা : যতীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য : কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিরচিত বিখ্যাত ‘ঘুমের ঘোরে’ কবিতাটি তাঁর মরীচিকা (১৩১৭-১৩২৯) নামক কাব্যগ্রন্থে অন্তর্গত। এই দীর্ঘ কবিতাটি মোট সাতটি ‘ঝোঁকে’

অর্থাৎ অংশ বা খণ্ডে রচিত। এই কবিতায় সমগ্র যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যের যেন সারাৎসার রক্ষিত আছে, কবির কবিতার ভাবসৌন্দর্য ও জীবনদর্শন চমৎকারভাবেই এখানে ফুটে উঠেছে। কবি ঘুমের ভিতর মগ্ন হয়ে কোনো রোমান্টিক স্বপ্নের গভীরে ডুবে যাননি, বরং স্তরে স্তরে বাস্তবতার উন্মোচন করেছেন। এই বাস্তবতা অনেকসময়েই তিক্ত এবং নির্মম। রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 'ঘুমের ঘোরে' এবং লোহার ব্যথা, দুঃখবাদী, ভাড়াটিয়া বাড়ি, খেজুরবাগান, মৎস্যশিকার, কেতকী, হাটে, বেদিনী, কচিডাব ইত্যাদি কবিতায় যথেষ্টই আছে। ভাবের দিক থেকে যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি রবীন্দ্রনাথের থেকে ভিন্ন পথে যাওয়ার প্রয়াস ও রবীন্দ্রবিদ্রোহ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় যথেষ্টই ছিল। ছন্দ ও আঙ্গিকে তিনি অবশ্য পূর্ববর্তী রোমান্টিক কবিতার ঐতিহ্যের বাইরে যাওয়ার খুব একটা চেষ্টা করেননি, তবে লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রায় অধিকাংশ কবিতাতেই ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবেই কবি ছন্দে পূর্ববর্তী কবিতার অতিউৎসাহ ও বৈচিত্র্য বর্জন করে একটা স্বেচ্ছাকৃত একঘেয়েমি বা একসুরা বিবর্ণতার চর্চা করেছেন। এভাবেই কবি তাঁর নিজস্ব mood বা মেজাজ আবিষ্কারে এবং বিশ্বজোড়া নিরাশাবাদের স্বরূপ উন্মোচনে ব্রতী হয়েছেন।

৮.৫.১ কবিতা বিশ্লেষণ

'ঘুমের ঘোরে' কবিতার প্রথম ঝোঁক বা প্রথম অংশের

এসো গো বন্ধু আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা
তোমায় আমায় হয়ে যাক দুটো কাটাছাঁটা সোজা কথা

এই দুটি পঙ্‌ক্তি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে ব্যঙ্গ, পরিহাস, নাস্তিকতা, রোমান্টিসিজম-বিরুদ্ধতা, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, মননশীলতা ও বুদ্ধিবাদ এবং নিপুণ আত্মবিশ্লেষণ। সমস্ত কবিতার বক্তব্যেরই চমৎকার মুখবন্ধ এখানে রচিত হয়েছে। 'বন্ধু' নামক সম্বোধনের উদ্দিষ্ট হতে পারেন কবির দৃষ্টিতে দেখা এই জড় জগতের আপাত অদৃশ্য অধিপতি এক নিষ্ঠুর নিরপেক্ষ হৃদয়াহীন ঈশ্বর, আবার এই 'বন্ধু' সম্বোধনের মধ্যে আভাস রয়েছে রোমান্টিক কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের—এক মধুরতাবাদী আনন্দের উপাসক পরিপূর্ণ কল্পনাবাদী যাঁর বিরুদ্ধে দুঃখবাদী কবির অভিযোগ-প্রতিবাদের কন্ঠ উত্থিত। অবশ্য এই এককের বিদ্রোহকেও আমরা এক ধরনের অধঃপতিত বিপথগামী রোমান্টিসিজম বলে চিহ্নিত করতে পারি।

সৃষ্টি চমৎকার।
ঠোকাঠুকি নাই, গতিবিকানে বাঁধা আছে চারিধার।

—আস্তিক্যবাদীরা ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎকে মসৃণ সামঞ্জস্যময় বলেই ভাবতে চায়। কিন্তু ভুক্তভোগী কবিকথক জানেন মোদ্দা বাস্তবটা এই যে ঘোড়ার লোহার নালের আঘাতে পথ চলতে যখন পা খোঁড়া হয়ে যায় ও সেই খোঁড়া পা গাড্ডায় পড়ে সেখানে উচ্ছসিত ভক্তকথিত 'ঠাকুরের করুণা' খুব একটা পাওয়া যায় না।

এই নিরপেক্ষ নির্মম বিশ্বঘূর্ণনের দ্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে কবি বিস্মৃতির চির ঘুমঘোর কামনা করেন। অসঙ্গাতি এই যে আমরা তাঁকেই ডাকি এবং এভাবেই 'যন্ত্রণা পাই, সান্ত্বনা চাই—আপনাদের দিই কাঁকে। সুতরাং আলোচ্য কবিতায় মানব অস্তিত্বের ট্র্যাজেডিটুকু কবি হাড়ে হাড়েই বুঝেছেন।

কবি অনুভব করেছেন আমাদের সুখদুঃখ আমাদের অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষদেরই নিজস্ব সৃষ্টি। ঈশ্বর দারুমূর্তি জগন্নাথ, কারুকাছে কোনো কৈফিয়ত চান না। ঈশ্বরের ত্রুটির প্রতি ব্যঙ্গ দু'টি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিতে নিক্ষিপ্ত

তুমি শালগ্রাম শিলা
শোওয়া-বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা।

মানুষের inadequacy বা অপর্যাপ্ততাও তিনি লক্ষ করেছেন ; প্রেম, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে আমরা অনেক রোমান্টিক স্বপ্ন রচনা করেছি আদর্শবাদ বুনন করেছি কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সত্য বড়োই নির্মম ও কঠোর। অতএব কবির আত্মবীক্ষণ

মরণে কে হবে সাথী,

প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।

অসীম জড়ের ভিতর আমাদের চেতনাশক্তি ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো বিরাজ করে। এই চেতনার অতি উপস্থিতির ফলেই কবি দুঃখবাদের পথযাত্রী। জড়জগতে ঈশ্বর সকল শক্তি সংহত করে মহাজড়রূপে অবস্থানকারী। "সেই মহাঘুমে সাঁতারি বেড়াই মোরা স্বপনের ফেনা', আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু আমরা প্রেমে পিপাসায় দায়বন্ধ। যাকে আমরা শৃঙ্খলা বলে গর্ব করি তা আসলে স্বপ্নের মতো উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলানো। অতএব কবির উদ্ধত আত্মঘোষণা—

প্রেম বলে কিছু নাই

চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

'ঘুমের ঘোরে' কবিতার প্রথম অংশেই কবি তার মূল বক্তব্য পেশ করেছেন। পরবর্তী অংশগুলিতে সেই বক্তব্যের ক্রমবিস্তার রয়েছে। ঈশ্বর যে দুঃখী মানুষের কোনো কাজে আসেন না সেটাও কবি বেশ লক্ষ্য করেছেন—

বন্ধু প্রণাম হই—

শীতের বাতাসে জমে যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই ?

অধিকন্তু এই 'প্রথম ঝোঁকেই রয়েছে বিখ্যাত রবীন্দ্রবিদ্রোহ স্বয়ং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে যার উল্লেখ করেছেন—

কেন ভাই রবি, বিরক্ত করো ? তুমি দেখি সব-ওঁচা,

কিরণঝাঁটার হিরণকাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা।

জানি তুমি ভালো ছেলে

ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে।

তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,

শুধাই তোমায়—কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ ?

চেরাপুঞ্জির থেকে

একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে ?

শেষদুটি পঙ্‌ক্তি বাংলা সাহিত্যে প্রবাদপ্রতিম হয়ে গেছে। 'রবি' হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। কল্পনার অপূর্ব জগৎ তিনি নির্মাণ করেছেন ; কিন্তু চেরাপুঞ্জির মেঘসমৃদ্ধির রাজ্য থেকে বাস্তবের দুঃখতৃষ্ণার গোবিসাহারার মরুভূমি জগতে তৃষ্ণাহর বারিবর্ষী একটুকরো মেঘ আনবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। রোমান্টিক কবির কবিতা কল্পনা দিয়ে তৈরি রঙিন মায়াবুদবুদ যেন। মানুষের ভাগ্য পরিত্যক্ত কাটা লাটুর মতো ; ঈশ্বরপ্রেরিত দূত ধর্মপ্রবক্তারাও মানুষের দুঃখশেষের হদিশ দিতে পারেন না।

৮.৫.২ যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে জন ডানের সাদৃশ্য

সমালোচকেরা কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সঙ্গে সপ্তদশ শতকের ইংরেজ মেটাফিজিক্যাল কবিগোষ্ঠী বিশেষত তাঁদের প্রধানতম জন ডান এর কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। John Donne বলেছেন—"Poor intricate soule! Riddling, perplexed, labyrinthical soule." বেচারা মানুষের আত্মা সে হতভম্ব ভ্যাবাচাকা, গোলকধাঁধায় ঘুরে করা। পুনশ্চ "He that lies boyling on a Gridiron in others eies, lies in his own conceit upon a Bed of Pleasure." —মানুষ আত্মছলনা করে—সে ভাবে সে সুখের বিছানায় শুয়ে, সবাই দেখে আসলে সে তপ্ত কটাহে সেদ্ধ হচ্ছে। একটি কবিতায় Donne আরো বলেছেন—

Tis true, 'tis day; what though it be?
Or wilt thou therefore rise tromme?
Why should we rise, because 'tis light?
Did we lie downe, because twas night?
(Breake of day)

দিনরাত্রি হয় মনুষ্য-নিরপেক্ষভাবেই। আলো হয়েছে বলেই যে আমরা উঠে পড়ব তাতো নয়। তাতে রাত্রি হয়েছে বলেই যে আমরা শুয়ে পড়ি সেটাও অসত্য।

T. S. Eliot তার "The Metaphysical Poets" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন আধুনিক কবিতার পূর্বাভাস যেটা ফিজিক্যাল কবিতায় ছিল—বুদ্ধিবাদ, বিষম মোচড়ে আহরিত তুলনা বা Juxtaposition ইত্যাদির মধ্যেই এ ব্যাপারটা ছিল। লক্ষ্য করি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ঘুমের ঘোর' তথা কাব্যকবিতাবলিতেও আধুনিক বাংলা কবিতার পূর্ববর্তী ধাপ দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রবিদ্রোহ, নতুন ভাবের অন্বেষণ, বুদ্ধিবাদ, নানা বিপরীত তুলনা, সংশয়-ব্যঙ্গ-বিতর্ক ইত্যাদি ব্যাপারে এই ইঙ্গিত। আবার জন-এর পূর্বউদ্ধৃত চারপঙ্ক্তি যেখানে দিনের শুরু ও সূর্যোদয় বর্ণিত পাঠক লক্ষ করুন তার সঙ্গে 'কেন ভাই রবি বিকল্প করো' ইত্যাদি বক্তব্যের সমান্তরালতা বা কিঞ্চিত মিল রয়েছে।

৮.৫.৩ কবিতার প্রত্যেকটির ঝোঁকের বক্তব্য ও ভঙ্গি-বিশ্লেষণ

'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটির বক্তব্য কবি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তরকে সাতটি অংশে অপূর্ব সুন্দররূপে বিস্তার করেছেন। সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটোই শ্লেষ বা ঠাট্টা। স্রষ্টার পাষাণমুখে তাকাই বা না তাকাই আমাদের সুখদুঃখও একদিন ধুলা হয়ে যাবে। উপায়হীনকে অদৃষ্টের সঙ্গে চুক্তি করেই বেঁচে থাকতে হয়। পাষাণ দিয়ে একবার দেবতা গড়া হলে সে নিজে আর পাষাণে নির্ঝর করুণাধারা ঢালে না। দেবতার অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কবির উক্তিটি চমকপ্রদ, শব্দযোজনাও লক্ষ্য করবার মতো।

চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদূর চেটে
বিশ্বম্ভর হে গণেশবর, যোয় তোমারি পেটে।

মিল ব্যবহারের এ বক্রোক্তি বা বাকচমৎকৃতির উদাহরণ পাচ্ছি দুটি অতুলনা পঙ্ক্তিতে—

ঝিমঝিম নিশ্চিন্ত
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন তো।

রসিক পাঠক 'নিশ্চিন্ত'-র সঙ্গে 'দিন-তো' মিলের মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করুন। আর বক্তব্যে ঝাঁচকচকে হালফ্যাশানী ব্যাপারটাও দেখুন। বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতার বাঁকবদল আবার আসন্নপ্রায়।

তৃতীয় ঝোঁকে দুঃখবাদ ও বস্তুবাদের পাশাপাশি রোমান্টিক ভাবনার Contrast বা প্রতিতুলনা সাজানো হয়েছে। কবি কাব্যিকতার পথে যাচ্ছেন, কাব্যকে ভাঙবেন বলেই। একে আমরা বলতে পারি pseudo-romanticism বা ছদ্মরোমান্টিকতা।

আমার প্রাসাদে জ্বালাও লক্ষ নক্ষত্রের বাতি
রাহুকে বলো সে গিলুক সূর্যে না কাটে যেন এ রাতি।
বজ্রে বাঁকায়ে মেঘের মুকুট পরাও প্রিয়ার শিরে,
কণ্ঠের হার রচো গো তাহার তড়িতের তার ছিঁড়ে।
পুরাও প্রিয়ার আশ,
রামধনু দিয়ে জোৎস্না ধুনিয়ে রচো তার রাঙা বাস।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এখানে দেখালেন রবীন্দ্রীয় ঢঙে রোমান্টিক অতিশয়োক্তি রচনা করাও তিনিও কম যান না, তবুও তিনি সচেতনভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির মতো নির্বিচার রোমান্টিক পথে হাঁটলেন না। তরলিত বা diluted রোমান্টিসিজম তার জন্য নয়, তিনি কবিতায় খুঁজছেন নতুন বক্তব্য। আনন্দবাদের পুরোনো অনুকরণের বাড়াবাড়ির ফ্যাকাশে সময়ে তিনি এনে ধরলেন টাটকা মোড়কে মোড়া নতুন কবিতার সতেজ সংবাদ।

"The features of the metaphysical style are wellknown : analytic and self-conscious, colloquial in tone, dramatic in emphasis. It is also notorious for wild imagery, hyperhole, scrpulous intellectual construction, elaborate and ingenious working out of tropes." (Introduction : The Major Metaphysical poets (An anathology of Poems ed. by Edward Honing and Oscar Williams)। মেটাফিজিক্যাল কবিতার স্টাইল সুপরিচিত—বিশ্লেষণধর্মী ও আত্মসচেতন, কথ্যবাগভঙ্গির প্রতি পক্ষপাত, নাটকীয়তা এ কবিতায়। অধিকন্তু এ কবিতা ধাক্কা দেয় এর বন্য চিত্রকল্পের জন্য, আতিশয্যময় উক্তির জন্য, শব্দব্যবহারে ব্যঞ্জাত্মক প্রবণতার ঝোঁকের জন্য। বলা বাহুল্য এই বৈশিষ্ট্যগুলি "ঘুমের ঘোরে" কবিতায় যথেষ্টই আছে।

চতুর্থ ঝোঁকে—

হায় রে ভ্রান্ত কবি।
নয়নের আলো ম্লান হয়ে এল আঁকিতে মিছার ছবি।

সারা জীবন এ কোন অলক্ষ্য লক্ষ্মীর আরাধনা, জগৎ ভরিয়া দিয়ে যাও হৃদিরক্তের আলপনা ? এবং পঙ্‌ক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ও রোমান্টিক ঐতিহ্যের প্রতি আক্রমণ। 'হৃদিরক্তের আলপনা' রোমান্টিক কবিগুরু শেলীর 'I fall upon the thorns of life, I bleed' কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে,
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে !
দুঃখেরে তুমি দেবেনা আমল, ভাবি দেবতার দান,
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শোনাবে গভীর গান !
এ সবই রঙীন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা
গভীর নিঠুর সত্যের নূর দিনে দিনে পড়ে চাপা !
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা ?

—এখানেও উদ্দিষ্ট রবীন্দ্রনা। শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে মেটাফিজিক্যাল কবিতাসুলভ ব্যঙ্গের প্রতি ঝোঁক—সন্ন্যাসীসংঘের প্রতি বিদ্রূপ।

পঞ্চম ঝোঁকের শুরুটা নাটকীয়—'তোমাতে আমাতে বহুদিন হতে হয়নি কো কোনো কথা। গত বসন্তে গলা ভেজাতে যে চুমুক দিয়েছিলেন আজও তার নেশার ঘোর কাটেনি। অধিকন্তু ড্রেনে পড়ে যাওয়ার পর নিজের ভাঙা পাঁজরে নিজেই একটা ভেড়ার হাড় জুড়ে কবি বিষম বিপত্তি ঘটিয়েছেন—

উপরে মিলেছে বেমালুম হয়ে সিঙানো চামড়াপটি,
ভিতরে কিন্তু নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খটাখটি!

এখানে পাচ্ছি মেটাফিজিক্যাল কবিতাসুলভ কথ্যবাগভঙ্গীর প্রতি পক্ষপাত এবং 'hyperbola' বা 'exaggerated statement' অর্থাৎ আতিশয্যময় বক্তব্যের প্রবণতা এবং তার ফলে উৎপন্ন আত্মব্যঙ্গের আমেজ। অধিকন্তু রয়েছে বন্য চিত্রকল্প বা 'Wild imagery 'নর-ভেড়া-হাড়' বিষমবস্তুর সমাহার তাও লক্ষণীয়।

জীবনরহস্যের তল নেই। যন্ত্রণা যত বাড়ে ততই চিরপ্রহরী প্রাণবন্ধুকে মনে পড়ে। 'অসীমের কারাগার' ইত্যাদি কাব্যাংশ রবীন্দ্রকাব্যের ভগ্নাংশ স্মরণে আনে। বোঝা যাচ্ছে কবি এ কবিতায় বন্ধু বলে যাকে সম্বোধন করছেন, ঘুরে ঘুরে একই ধুঁয়া বা refrain এ বারবার ফিরে আসছেন, তার সঙ্গে নিজের একটা 'love-hate' বা একই সঙ্গে ভালোবাসা-ঘৃণার সম্পর্ক রয়েছে।

কিন্তু আমি যে মেপেছি বন্ধু, লোহার প্রাণের তাপ,
চৌদিকে তার ছড়ানো দেখেছি ফুলকির অভিশাপ।

শুধু নির্যাতিতের পক্ষসমর্থন নয়, চিত্রকল্প ও বক্তব্যের নতুনত্বও আছে। ইঞ্জিনিয়ার যন্ত্রবিদ কবির উপযুক্তই এই বাগব্যবহার।

ষষ্ঠ ঝোঁকে পাচ্ছি সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলি যেখানে রোমান্টিক কল্পনাবিলাসী কবিতার প্রতি তাঁর বিদ্রোহ ও কবিতায় নতুন ভাবনা আনবার অঙ্গীকার পাচ্ছি—

কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস।
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি।
... ...
ঢেলে সাজো ঢেলে সাজো
সকল দুঃখ সূক্ষ্ম হউক, যত সাদা কব কালো!

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর "কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

জীবনসমস্যা, কবিমননের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বাস্তব ও কল্পনার চিরন্তন বিরোধিতা ও সমন্বয় খুঁজবার তাড়না ইত্যাদি সবই 'ঘুমের ঘোরে' কবিতার বিশিষ্ট সম্পদ। সপ্তম ঝোঁকে রয়েছে রহস্যময় 'বন্ধু'-র সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছোনোর চেষ্টা। কবি সিদ্ধান্ত নিলেন এই নতুন ঈশ্বর আনন্দ নয় দুঃখেরই ফেরিওলা—

আনন্দ নহ নহ,
দিচ্ছ দুঃখ নিচ্ছ দুঃখ—দুঃখেরি ফেরি বহ !

কবির শেষতম উক্তি তাই মূল্যবান জীবনসমস্যার সমাধানে পৌঁছোনোর এই এক হৃদয়গ্রাহী চেষ্টা—'অশ্রু পরশি অগত্যা আজ করিলাম আধাসন্ধি'। তবে স্বভাবের দোষ তো দেখা যায় না, বিদায়সম্ভাষণে অভ্যাসিক খোঁচাটা মারতে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ভোলেননি—

প্রণাম প্রণাম ভাই
শত ঝঞ্ঝাটে তোমা হেন যেন অঘোরে ঘুমাতে পাই ॥

৮.৫.৪ উপসংহার : যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের বৈশিষ্ট্য

মোহিতলাল মজুমদারের দুঃখবাদ দার্শনিক শোপেন হাওয়ারকে মনে করিয়ে দিয়েছে। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ জন ডন প্রভৃতি বুদ্ধিবাদীদের মনে করিয়ে দেয়। জীবনের নিষ্ঠুর অসঙ্গাতি বা amomaly-র উপলব্ধি থেকেই এই দুঃখবাদের জন্ম। এই পৃথিবীতে দুঃখী ও ভোগীর পাশাপাশি অবস্থান। আধুনিক কালের কবি ডারউইন ইত্যাদির Theory of Evolution বা বিবর্তনবাদ বা 'survival of the fittest'—যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন ইত্যাদি তত্ত্ব ভালোভাবেই অবগত আছেন বোঝা যায়।

স্বয়ং মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'সাহিত্যবিতান' নামক গ্রন্থের 'কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত' নামক নিবন্ধে এই কবি সম্বন্ধে একটি দিগদর্শনী আলোচনা করেছেন। "কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের সেই রসকল্পনার দুঃসাধ্য অনুকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার ফলে বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া, অতি উচ্চ ভাবকল্পনার অভিমানে—মানবহৃদয়ের যে সত্য, দেহ সংস্কারের যে অতিজাগ্রৎ অনুভূতি—তাহার প্রতি মিথ্যাচারণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।" যতীন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু সেই মিথ্যাচারণের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ রয়েছে।

৮.৬ অনুশীলনী

(ক) মানকুমারী-বৃত্ত

১। "একা" কবিতাটি বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকের মহিলা কবিদের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিন।

২। "ঘুমের ঘোরে" কবিতাটি বিশ্লেষণ করে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জীবনদর্শন—দুঃখবাদ ও বুদ্ধিবাদ নিয়ে আলোচনা করুন।

৩। মোহিতলাল মজুমদারের 'কালাপাহাড়' অবলম্বন করে কবির জীবনচেতনা ও কাব্যচেতনার পরিচয় দিন।

৪। নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে এ কবিতায় প্রকাশিত বলিষ্ঠ মানসবতাবাদের পরিচয় দিন।

৫। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কবর-ই-নূরজাহান' কবিতাটি বিশ্লেষণ করে তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় দিন।

৬। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিশেষ অবস্থান নিয়ে পাঠ্যকবিতা অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(খ) জীবনানন্দ-বৃত্ত

১। পাঠ্যকবিতা অবলম্বনে আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্ব বুঝিয়ে দিন।

২। 'জল দাও' কবিতাটি বিশ্লেষণ করে সমাজচেতনা ও কাব্যচেতনার পরিচয় দিন।

৩। ‘বোধ’ কবিতাটি বিশ্লেষণ করে জীবনানন্দের কবিসত্তায় এই বোধের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। ‘বোধ’ কবিতার ভাব ও আঙ্গিক নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৫। ‘শাশ্বতী’ কবিতাটি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত একটি অনবদ্য প্রেমের কবিতা ও অপরূপ লিরিক—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৬। ‘হে মহাজীবন’ বিশ্লেষণ করে এখানে প্রকাশিত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মানবতাবাদ, সমাজচেতনা ও আপাত রোমান্টিক বিরোধিতার স্বরূপ বুঝিয়ে দিন।

৭। ‘ইতিহাস’ কবিতায় অমিয় চক্রবর্তীর বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করুন। এখানে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় আধুনিকতার শিল্পতত্ত্ব কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে?

৮। ‘নিসর্গের বুকে’ কবিতাটি বিশ্লেষণ করে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রে কবিসত্তার পরিচয় দিন।

৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

(ক) বনলতা সেন-বৃত্ত

দীপ্তি ত্রিপাঠী	:	আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়
বুদ্ধদেব বসু	:	কালের পুতুল
বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত)	:	আধুনিক বাংলা কবিতা
মঞ্জুভাষ মিত্র	:	আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব
মঞ্জুভাষ মিত্র	:	আধুনিক বাংলা কবিতা
(খ) মানকুমারী বসু বৃত্ত		
ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র	:	সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ
মোহিতলাল মজুমদার	:	বিস্মরণী সাহিত্যবিতান আধুনিক বাংলা সাহিত্য
মজফফর আহমেদ	:	নজরুল ইসলাম
রফিকুল ইসলাম	:	নজরুলের জীবন ও সাহিত্য
ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	:	ঊনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতা